banglabook.com

কী ভাবে?

পৃথিবীর যে চৌম্বকক্ষেত্র আছে সেটা দিয়ে। কম্পাস যেরকম পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দিয়ে উত্তরদক্ষিণ বুঝতে পারে, কবুতরও সেরকম। কী ভাবে চৌম্বকক্ষেত্রটা বুঝতে পারে সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কিন্তু পারে যে, সেটা সবাই জানে।

তাই নাকি? হোটেল মালিকের চোখে–মুখে একটা অবাক হওয়ার ছাপ এসে পড়ে।

হ্যাঁ, খুব সহজ একটা পরীক্ষা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। কবুতরের মাথায় একটা ছোট চুম্বক বেঁধে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র থেকে অনেক শক্তিশালী। ব্যাস, দেখা গেল কবুতর আর কিছুতেই দিক ঠিক রাখতে পারে না। খুব সহজ একটা পরীক্ষা।

বলতে বলতে সফদর আলী উঠে দাঁড়ান, কখনো সুযোগ পেলে করে দেখবেন পরীক্ষাটা। ছোট একটা চুম্বক নিয়ে কবুতরের মাথায় লাগিয়ে দেবেন, আমার কাছে আছে একটা, এই যে—সফদর আলী তাঁর আঙুলের ডগায় করে কালো মতন একটা চুম্বক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দেন।

হোটেল মালিক একটু অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে চুম্বকটি নেন। কী যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে। মুখটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে।

আমি বললাম, সফদর সাহেব চলুন যাই, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ, চলুন। সফদর আলীও উঠে দাঁড়ালেন।

মস্ত বড় একটা হেরোইন কারবারির দল ধরা পড়ল। হোটেল মালিক ছিল সেই দলের নাটাই। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে ভোল পাল্টে। এয়ারপোর্টে ধরা হয়েছে। বর্ডারে প্রায় জনা ত্রিশেক লোক ধরা পড়েছে—কিছু এদেশের কিছু বার্মার। হেরোইন আটক করেছিল প্রায় এক কোটি টাকার মতো। মতিনের অনেক নাম হল সেবার। দুটো নাকি প্রমোশন হয়ে গেছে একবারে। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদেরও খুব নাম হবে। কিন্তু ব্যাপারটা নাকি খুব গোপন। আমাদের নাকি জানার কথাই নয়। তাই আমাদের কথাটা চেপে গিয়েছিল। মতিন বলেছে আমাদের নাকি খুব একপেট খাইয়ে দেবে একদিন। এখনো দেয় নি, অপেক্ষা করে আছি, যদি কিছুদিনের মধ্যে না খাওয়ায়, বলে দেব সবাইকে। কিরকম মাথা খাটিয়ে আমি আর সফদর আলী এত বড় একটা হেরোইন কারবারির দলকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম—কেউ বিশ্বাস করবে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন!

মোরগ

সফদর আলী সাবধানে পকেট থেকে কী একটা জিনিস বের করে আমার হাতে দিলেন। হাতে নিয়ে আমি চমকে উঠি, একটা মাকড়সা। চিৎকার করে আমি

মাকড়সাটাকে প্রায় ছুড়ে ফেলেছিলাম—সফদর আলী হা হা করে উঠলেন, করছেন কি? এটা জ্যান্ত মাকড়সা নয়, ইলেকট্রনিক মাকড়সা।

আমার তখনো বিশ্বাস হয় না। টেবিলের উপর কোনোমতে ফেলে দিই কুৎসিত মাকড়সাটাকে। সেটা ঠিক জ্যান্ত মাকড়সার মতো হেঁটে বেড়াতে থাকে। ঘেন্নায় আমার প্রায় বমি হবার মতো অবস্থা, মাকড়সা আমার ভারি খারাপ লাগে। কেউ যদি বলে একটা ঘরে একটা জ্যান্ত মাকড়সার সাথে থাকবে না একটা জ্যান্ত বাঘের সাথে থাকবে? আমি সম্ভবত বাঘের সাথেই থাকব।

সফদর আলী হাসতে হাসতে বললেন, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এটা ইলেকট্রনিক, দুটো মাইক্রোপ্রসেসর আছে ভেতরে। দু'মাস লেগেছে তৈরি করতে।

দু'মাস খরচ করে একটা মাকড়সা তৈরি করেছেন? আমার বিশ্বাস হয় না, সফদর আলী দু'ঘন্টায় একটা পুরো কম্পিউটার খুলে আবার জুড়ে দিতে পারেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সময় লাগবে না? এইটুকু মাকড়সার শরীরে কতকিছু ঢোকাতে হয়েছে জানেন? পাওয়ার সাপ্লাই থেকে শুরু করে লজিক গেট, মাইক্রোপ্রসেসর, র‍্যাম, স্টেপ মোটর, গিয়ার—

এত কষ্ট করে একটা মাকড়সা তৈরি করলেন? একটা ভালো কিছু তৈরি করতে পারতেন, প্রজাপতি বা পাখি। কে মাকড়সা দিয়ে খেলবে?

সফদর আলী একটু আঘাত পেলেন বলে মনে হল। গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কি ভাবছেন এটা খেলার জিনিস?

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, তাহলে কি?

কাছে আসেন, আপনাকে দেখাচ্ছি।

আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। তিনি আমার শার্টের ফাঁক দিয়ে মাকড়সাটাকে ঢুকিয়ে দিলেন। সেটা হেঁটে হেঁটে আমার পিঠের উপর এক জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। যদিও জানি এটা সত্যিকার মাকড়সা নয়, নেহায়েত ইলেকট্রনিক কলকব্জা, তবুও আমার সারা শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। আমি শরীর শক্ত করে দম বন্ধ করে বসে থাকি। মাকড়সাও বসে থাকে চুপ করে। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল এভাবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

সফদর আলী বললেন, কিছু হচ্ছে না?

নাহ্।

শরীরের কোনো জায়গা চুলকোচ্ছে না?

নাহ্।

তিনি খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বললেন, আসলে আপনি যদি এমন একটা কাজ করতে থাকেন যে, হাত সরানোর উপায় নেই তাহলে শরীরের কঠিন কঠিন জায়গা চুলকাতে থাকে।

আমি মাথা নাড়লাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু মাকড়সার সাথে শরীর চুলকানোর কী সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সফদর আলীর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এগিয়ে এসে বললেন, আপনার হাত দুটি দিন।

banglabook.com

আমি হাত দুটি এগিয়ে দিতেই কিছু বোঝার আগে তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত দুটি চেয়ারের হাতলের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী করছেন?

এখন আপনার হাত দুটি বাঁধা। কাজেই শরীরের কোনো জায়গা চুলকালে আপনি চুলকাতে পারবেন না।

হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?

কাজেই এখন আপনার শরীরের নানা জায়গা চুলকাতে থাকবে। সফদর আলী চোখ নাচিয়ে বললেন, কি, সত্যি বলেছি কি না?

কথাটা সত্যি। ছেলেবেলায় যেদিন রোজা থাকতাম, ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ত আজ খাওয়া বন্ধ। সাথে সাথে খিদে লেগে যেত। এবারেও তাই হঠাৎ মনে হতে থাকে ঘাড়ের কাছে একটু একটু চুলকাচ্ছে। সত্যি তাই, চুলকানি বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। অন্যমনস্ক হলে চুলকানি চলে যাবে ভেবে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোথায় কি, চুলকানি বাড়তেই থাকে। সফদর আলীকে হাত দুটি খুলে দিতে বলব, এমন সময় হঠাৎ টের পাই মাকড়সাটা ঘাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। হেঁটে হেঁটে যেখানে চুলকাচ্ছে ঠিক সেখানে এসে চুলকে দিতে থাকে। আরামে আমার চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে যখন বাগানে কাজ করে কাদায় হাত মাখামাখি হয়ে যেত, তখন পিঠে কোথাও চুলকালে ভাগনেকে বলতাম চুলকে দিতে। সে কিছুতেই ঠিক জায়গাটা বের করতে পারত না। আমি বলতাম, আরেকটু উপরে, সে বেশি উপরে চলে যেত। বলতাম, আরেকটু নিচে, সে বেশি নিচে চলে যেত। যখন জায়গাটা মোটামুটি বের করতে পারত তখন হয় বেশি জোরে না হয় বেশি আস্তে চুলকে দিত, কিছুতেই ঠিক করে চুলকাতে পারত না। এই মাকড়সাটা অপূর্ব, উপরেও নয়, নিচেও নয়, ঠিক জায়গাটাতে ঠিকভাবে চুলকাতে থাকে। যখন ভাবলাম আরেকটু জোরে হলে ভালো হয় মাকড়সাটা ঠিক আরেকটু জোরে চুলকাতে থাকে, আশ্চর্য ব্যাপার!

সফদর আলী আমার মুখের ভাব লক্ষ করছিলেন, এবারে হাতের বাঁধন খুলে দিতে দিতে একগাল হেসে বললেন, দেখলেন তো এটা কী করতে পারে?

আমার স্বীকার করতেই হল ব্যাপারটা অসাধারণ। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না যে এটা আদৌ তৈরি করা সম্ভব।

সফদর আলী জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবে কাজ করে বুঝেছেন?

আমি কী ভাবে বুঝব?

একটুও বুঝতে পারেন নি? সফদর আলীর একটু আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল। এই যে আটটা পা দেখছেন এগুলো হচ্ছে আটটা নার্ভ সেন্সর। শরীরের নার্ভ থেকে এটা কম্পন ধরতে পারে। সেটা থেকে এটা বুঝতে পারে কোথাও চুলকাচ্ছে কি না। যখন বুঝতে পারে, তখন সেটা সেন্ট্রাল সি. পি. ইউ.-তে একটা খবর পাঠায়। সাথে সাথে ফিডব্যাক সার্কিট কাজ শুরু করে দেয়—

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। নিঃসন্দেহে জিনিসটা অসাধারণ। কিন্তু এত কষ্ট করে এরকম একটা জিনিস তৈরি করার সত্যি কি কোনো প্রয়োজন ছিল? সফদর আলীর এত প্রতিভা, সেটা যদি সত্যিকার কোনো কাজে লাগাতেন, যেটা দিয়ে সাধারণ

banglabook.com

মানুষের কোনোরকম উপকার হত—

কী হল? আপনি আমার কথা শুনছেন না, অন্যকিছু ভাবছেন।

না না, শুনছি।

তাহলে বলুন তো স্টেপিং মোটরে কত মাইক্রো সেকেন্ড পরপর টি. টি. এল পাল্‌স্ পাঠাতে হয়?

আমি মাথা চুলকে বললাম, শুনেছি মানে তো নয় বুঝেছি। শোনা আর বোঝা কি এক জিনিস?

তার মানে আপনি কিছু বোঝেন নি?

ডিটেলস বুঝি নি, কিন্তু মোটামুটি আইডিয়াটা পেয়েছি।

সফদর আলী পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলে খুলে ধরেন। ভয়ানক জটিল একটা সার্কিট। তার মাঝে এক জায়গায় একটা আঙুল ধরে বললেন, এখান থেকে শুরু করি। আপনি তাহলে বুঝবেন। এই যে দেখছেন—

আমি তাঁকে থামালাম। বললাম, সফদর সাহেব, আমি এসব ভালো বুঝি না, খামোকা আপনার সময় নষ্ট হবে। এর থেকে অন্য একটা জিনিস আলোচনা করা যাক।

কী জিনিস?

এই মাকড়সাটা তৈরি করার প্রয়োজনটা কি?

সফদর আলী খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমি ভাবলাম মাকড়সারা কী করে সেটা অন্তত বুঝেছেন। যখন কোনো জায়গায় চুলকাতে থাকে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বুঝেছি। কিন্তু সেটা কি এতই জরুরি জিনিস?

জরুরি নয়? আমি যখন কাজ করি তখন দুটো হাতের দরকার, তার মাঝে যদি কোনো জায়গা চুলকাতে থাকে আমি কী করব?

ঠিক আছে মানলাম, এরা যথেষ্ট জরুরি। কিন্তু এর থেকে জরুরি কোনো জিনিস নেই?

কী আছে? এর থেকে জরুরি কী হতে পারে?

আপনার কাছেই জরুরি হতে হবে সেটা ঠিক নয়। অন্য দশজন মানুষের জন্যে জরুরি হতে পারে। আপনার এরকম প্রতিভা, সেটা যদি সত্যিকার কাজে লাগান, কত উপকার হত।

কি রকম কাজ?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, গরিব দেশ আমাদের, লোকজন খেতে-পরতে পারে না। যদি গবেষণা করে বের করতেন খাওয়ার সমস্যা কী ভাবে মেটানো যায়, বিশেষ ধরনের ধান, যেখানে চাল বেশি হয় বা বিশেষ ধরনের মাছ, যেটা তাড়াতাড়ি বড় করা যায় আবার খেতেও ভালো। কিংবা গরু-বাছুর বাড়ানোর সহজ উপায়। দুধের এত অভাব! দেশে সব গরিব বাচ্চারা রোগা রোগা, তাদের জন্যে যদি কিছু করতেন। কিংবা সস্তা কাপড় যদি তৈরি করতে পারতেন, সবাই যদি ভদ্র কাপড় পরতে পারত—

সফদর আলী কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে

বসে থেকে চিন্তিতভাবে নিজের গোঁফ টানতে থাকেন। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করলাম, তিনি হাঁ হাঁ করে উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু আলাপে যোগ দিলেন না। আমার তাঁর জন্যে একটু খারাপই লাগে। বেচারা বিজ্ঞানী মানুষ। একটা আশ্চর্য জগতে বাস করেন। সত্যিকার মানুষের জীবন দেখেও দেখেন না, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে নিশ্চয়ই খুব বিব্রত করে দিয়েছি। কিন্তু তাঁর যেরকম প্রতিভা—যদি সত্যি সাধারণ মানুষের জন্যে মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বের করেন, খারাপ কী?

পরের সপ্তাহে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামে লেখা :

আপনি ঠিক। মাকড়সা চুরমার। খাদ্য গবেষণা।

বিষয়বস্তু পরিষ্কার, আমার কথা ঠিক, তাই তিনি তাঁর মাকড়সাকে চুরমার করে খাদ্যের উপর গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। মাকড়সাটির জন্যে আমার একটু দুঃখ হয়, চুলকানোর এরকম যন্ত্র চুরমার করে ফেলার কি প্রয়োজন ছিল?

পরের সপ্তাহে আরেকটা টেলিগ্রাম পেলাম, তাতে লেখা :

ডিম। মুরগি। মুরগি ফার্ম। ইনকিউবেটর। কম্পিউটার কন্ট্রোল।

মানে বুঝতে মোটেই অসুবিধে হল না। তিনি মুরগির ফার্ম তৈরি করার কথা ভাবছেন। সেখানে ইনকিউবেটর ব্যবহার করে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হবে। চমৎকার ব্যবস্থা। তবে কম্পিউটার ব্যবহার করে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে ব্যাপারটি আমাকে ঘাবড়ে দিল। একটি মুরগির ফার্ম চালানোর জন্যেযদি কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়, তাহলে লাভ কি? সফদর আলীর গবেষণা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবার আগে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। ভাগ্য ভালো আমার, সফদর আলী বাসাতেই ছিলেন, জংবাহাদুর দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল, সফদর আলীর কাছে পৌঁছে দিয়ে সে নিজে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে। পাশের টেবিলে খাবার, সামনে টেলিভিশন চলছে, বানরের উপর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাই জংবাহাদুরের মুখে একটা পরিষ্কার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি।

সফদর আলীর টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো খাঁচা, সেখানে অনেকগুলো নানা বয়সের মোরগ-মুরগি হেঁটে বেড়াচ্ছে। সফদর আলী গম্ভীর মুখে একটা মুরগির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাতে কাগজ-কলম, মুরগির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে একটু পরপর কী যেন লিখছেন। উঁকি মেরে দেখে মনে হল আধুনিক কবিতা, কারণ তাতে লেখা :

ডান বাম ডান বাম ডান ডান বাম
বাম ডান বাম ডান বাম বাম বাম
বাম বাম ডান বাম বাম ডান বাম...

সফদর আলী খাতা বন্ধ করে বললেন, মোরগের সাথে মানুষের পার্থক্য কি বলেন দেখি?

মাথা চুলকে বললাম, আমরা মোরগকে রান্না করে খাই, মোরগ আমাদের রান্না করে খায় না।

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, আপনাকে নিয়ে এই হচ্ছে মুশকিল, খাওয়া ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারেন না।

কথাটা খানিকটা সত্যি, আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম।

banglabook.com

সফদর আলী বললেন, মানুষের দুটি চোখই সামনে। তাই তাদের বাইনোকুলার–দৃষ্টি। কোনো জিনিসের দিকে তাকিয়ে তারা দূরত্ব বুঝতে পারে। এক চোখ বন্ধ করে সুইয়ে সুতো পরানোর চেষ্টা করে দেখবেন কত কঠিন। বোঝা যায় না সুইটা কাছে না দূরে। মোরগের দুই চোখ দুই পাশে, তাই দূরত্ব বুঝতে হলে মোরগকে ক্রমাগত মাথা নাড়তে হয়। একবার ডান চোখে জিনিসটা দেখে, একবার বাম চোখে। বেশিরভাগ পাখিও মোরগের মতো। এজন্যে পাখিরাও মাথা নাড়ে। এই দেখেন আমি লিখছিলাম মোরগ কী ভাবে তার চোখ ব্যবহার করে।

সফদর আলী তাঁর খাতা খুলে দেখালেন। যেটাকে একটা আধুনিক কবিতা ভেবেছিলাম, সেটা আসলে মোরগের মাথা নাড়ানোর হিসেব। আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। সফদর আলী এখন কবিতা লেখা শুরু করলে ভারি দুঃখের ব্যাপার হত।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি তাঁর মুরগির ফার্ম এবং ইনকিউবেটরের কথা জানতে চাইলাম। সফদর আলী খুব উৎসাহ নিয়ে একটা বড় খাতা টেনে বের করে আনেন। অল্প একটা জায়গায় অনেক মুরগি বড় করার পরিকল্পনা, ইনকিউবেটরে ডিম ফোটানো হবে। ইনকিউবেটর জিনিসটা নাকি খুব সহজ, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রেখে তাপমাত্রা বাইশ দিন ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট করে রাখতে হয়। সফদর আলী তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ ব্যবহারের কথা ভাবছেন, তাহলে তাপমাত্রা ঠিক রাখা নাকি পানির মতো সোজা। তাঁর একটিমাত্র সমস্যা, সেটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। মোরগের বাচ্চার কী ক্ষতি করবে সেটা ঠিক জানেন না। ডিমগুলোকে দিনে দু'বার করে ঘুরিয়ে দেয়া এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে একটা ছোট কম্পিউটার থাকবে। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে ইনকিউবেটর যেন বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্যে একটি ডায়নামোও নাকি বসানো হবে।

আমি সফদর আলীকে থামালাম। বললাম, ইনকিউবেটর তৈরি করে ডিম ফুটিয়ে মোরগের ফার্ম তৈরি করবেন খুব ভালো কথা, কিন্তু সেটা চালানোর জন্যে যদি তেজস্ক্রিয় মৌলিক বা কম্পিউটার লাগে, তাহলে লাভ কী হল? ওসব চলবে না—

কেন চলবে না? সফদর আলী উত্তেজিত হয়ে বললেন, জিনিসটা কত সহজ হয় জানেন? একবার সুইচ অন করে ভুলে যেতে পারবেন।

ভুলে যাওয়ার দরকারটা কী? আমাদের দেশে মানুষের কি অভাব? আমি সফদর আলীকে বোঝানোর চেষ্টা করি, এমনভাবে ইনকিউবেটরটা তৈরি হবে, যেন জিনিসটা হয় সহজ, দাম হয় খুবই কম। ডিম উল্টেপাল্টে দেয়ার জন্যে কম্পিউটার লাগবে কেন? এক জন মানুষ খুব সহজেই দিনে দুইবার করে উল্টে দিতে পারবে। আপনাকে তৈরি করতে হবে জিনিসটার সত্যিকার ব্যবহার মনে রেখে।

সফদর আলী কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যান, খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা করে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। জিনিসটা তৈরি করতে হবে সাধারণ জিনিস দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে।

হ্যাঁ, সম্ভব হলে যেন ইলেকট্রিসিটি ছাড়াই চালানো যায়, গ্যাস কিংবা কেরোসিন দিয়ে।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একগাল হেসে বললেন, তাহলে তো জিনিসটা তৈরি করা খুবই সহজ। একদিনে বানাতে পারব। ভাবছিলাম ফাইবার গ্লাস

দিয়ে বানাব। কিন্তু তার দরকার নেই। কেরোসিন কাঠ দিয়ে পুরো জিনিসটা তৈরি হবে। দু' প্রস্থ কাঠের মাঝখানে থাকবে ভুসি। তাহলে তাপটা বেরিয়ে যাবে না। গ্যাসের চুলা দিয়ে বাতাসটা গরম করা হবে। বাতাসটা ভেতরে ছড়িয়ে যাবে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্যে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গামলায় পানি রাখা হবে। পানি বাষ্পীভূত হয়ে নিজে থেকেই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঠিক রাখবে, যে জিনিসটা একটু কঠিন সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা ঠিক রাখা। একটা ছোট ফিডবাক সার্কিট তৈরি করতে হবে সেজন্যে, সস্তা অপ এম্প দিয়ে বানাব। খরচ পড়বে খুবই কম। ইনকিউবেটরের ভিতরের তাপমাত্রাটা দেখে বাতাসের প্রবাহটাকে বাড়িয়ে না হয় কমিয়ে দেবে। চালানোর জন্যে লাগবে মাত্র দুটো ৯ ভোল্টের ব্যাটারি। কাঠের ট্রেতে ভুষির উপরে থাকবে ডিম, ডিমের কেস তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই। একসাথে এক হাজার ডিম ফোটানো যাবে।

ফিডব্যাক সার্কিটের ব্যাপারটা ছাড়া পুরো জিনিসটা আমি বুঝতে পারলাম। সত্যিই যদি এত সহজে বানানো যায়, তাহলে তো কথাই নেই। সফদর আলীর উপর আমার বিশ্বাস আছে, তিনি ঠিক ইনকিউরেটর তৈরি করে দেবেন, যেটা একমাত্র সমস্যা সেটা হচ্ছে, সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর আবিষ্কারে কঠিন কঠিন জিনিস জুড়ে দিতে চান। কী একটা হয়েছে আজকাল, কম্পিউটার ছাড়া কথা বলতে চান না।

ইনকিউবেটর নিয়ে আলোচনা করতে করতে সফদর আলী বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কাগজ বের করে তখন-তখনি জিনিসটা আঁকতে শুরু করেন। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, শুরু করার আগে একটু চা খেলে কেমন হয়?

সফদর আলী বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তারপর জংবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, জংবাহাদুর, চা বানাও।

জংবাহাদুর একবার আমার দিকে, একবার সফদর আলীর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে চা বানাতে উঠে গেল।

সপ্তাহখানেক খেটেখুটে সফদর আলী তাঁর ইনকিউবেটর তৈরি করলেন। জিনিসটা দেখতে একটা পুরানো সিন্দুকের মতো। কিন্তু সফদর আলীর কোনো সন্দেহ নেই যে এটা কাজ করবে। ইকিউবেটরটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে সফদর আলী একদিন ডিম কিনতে গেলেন। ভাবলাম হয়তো গোটা দশেক ডিম কিনে আনবেন, যদি নষ্ট হয় তাহলে এই দশটা ডিমের উপর দিয়েই যাবে। কিন্তু সফদর আলী সেরকম মানুষই নন, ইনকিউবেটরের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, বাজার ঘুরে ঘুরে তিনি পাঁচ শ' চৌদ্দটা ডিম কিনে আনলেন। পাঁচ শ' বারটা যাবে ইনকিউবেটরের ভেতরে। দুটি সকালের নাস্তা করার জন্যে।

সেদিন বিকেলেই ডিমগুলো ইনকিউবেটরে ঢোকানো হল। ব্যাপারটি দেখার জন্যে আমি অফিস ফেরত সকাল সকাল চলে এলাম। পেন্সিল দিয়ে সফদর আলী সবগুলোর উপর একটি করে সংখ্যা লিখে দিলেন। এতে ডিমগুলোর হিসেব রাখাও সুবিধে, আবার উল্টে দিতেও সুবিধে। সংখ্যাটি তখন নিচে চলে যাবে। ডিমগুলো সাজিয়ে রেখে ইনকিউবেটরের ঢাকনা বন্ধ করে সফদর আলী গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে দিলেন। শোঁ শোঁ করে চুলা জ্বলতে থাকে। দেখতে দেখতে তাপমাত্রা বেড়ে ১০২ পর্যন্ত উঠে সেখানে স্থির হয়ে যায়। এখন এইভাবে বাইশ দিন যেতে হবে। তা হলে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে

banglabook.com

বের হবে।

পরের বাইশ দিন আমার খুব উত্তেজনায় কাটে। ইনকিউবেটর কেমন কাজ করছে, সত্যি সত্যি ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে কি না এসব নিয়ে কৌতূহল। সফদর আলীর কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনা নেই। তিনি জানেন এটা কাজ করবে। বিজ্ঞানী মানুষ, আগে অনেককিছু তৈরি করেছেন, কোনটা কাজ করবে, কোনটা করবে না কী ভাবে জানি আগেই বুঝে ফেলেন। বাইশ দিন পার হওয়ার আগেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে শুরু করে। সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তুলতুলে হলুদ রঙের কোমল গা। কিচকিচ করে ডেকে হৈচৈ শুরু করে দিল। আমি, সফদর আলী আর জংবাহাদুর মহা উৎসাহে বাচ্চাগুলোকে ইনকিউবেটর থেকে বের করে আনতে থাকি। সফদর আলী ওদের রাখার জন্যে ট্রে তৈরি করে রেখেছিলেন। তার উপরে নামিয়ে রেখে সেগুলো উষ্ণ একটা ঘরে রাখা হল। বাচ্চাগুলোকে খাওয়ানোর জন্যে বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি করে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে নাকি নানারকম ভাইটামিন আর ওষুধ দেয়া আছে। মোরগের অসুখবিসুখ যেন না হয় সেজন্যে এই ব্যবস্থা।

পরদিন সকালের ভেতর পাঁচ শ' তিনটা মোরগছানা কিচকিচ করে ডাকতে থাকে। ছোট ছোট হলুদ রেশমী বলের মতো বাচ্চাগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। নয়টা ডিম নষ্ট হয়েছে, সফদর আলী সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন বলে আলাদা করে রেখেছেন। পাঁচ শ' মুরগির ছানাকে বড় করার দায়িত্ব খুব সহজ ব্যাপার নয়। সফদর আলী বুদ্ধি করে আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন বলে রক্ষা। জংবাহাদুর এমনিতেই অলস প্রকৃতির। কিন্তু মোরগের বাচ্চাগুলো দেখাশোনায় তার খুব উৎসাহ। কেউ আশেপাশে না থাকলে সে বাচ্চাগুলোকে হাতে পায়ে ঘাড়ে নিয়ে খেলা করতে থাকে। বাচ্চাগুলোও এই কয়দিনে জংবাহাদুরকে বেশ চিনে গেছে। দেখলেই কিঁচকিঁচ করে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরে।

এই ইনকিউবেটরটাকে কী ভাবে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে সফদর আলীর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু সফদর আলী এখন সেটা করতে রাজি না। তিনি বাচ্চাগুলোকে আগে বড় করতে চান। মোরগের বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি বড় করার তাঁর কিছু ওষুধপত্র আছে। সেগুলো দিয়ে তাদের বড় করে তুলে যখন ডিম পাড়া শুরু করবে, তখন সেই ডিম দিয়ে আবার বাচ্চা ফোটাতে চান। খুব অল্প জায়গায় কী ভাবে অনেক মোরগকে রাখা যায় সে ব্যাপারেও তিনি একটু গবেষণা করতে চান। সবকিছু শেষ করে পুরো পদ্ধতিটা ইনকিউবেটরের সাথে তার বিলি করার ইচ্ছা।

ভেবে দেখলাম তাঁর পরিকল্পনাটা খারাপ নয়। শুধু ইনকিউবেটরে ডিম ফোটালেই তো হয় না, সেগুলো আবার বড়ও করতে হয়। সেটি ডিম ফোটানো থেকে এমন কিছু সহজ ব্যাপার নয়।

পরের কয়েক সপ্তাহ আমার সফদর আলীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হল। তার প্রয়োজন ছিল। কারণ একা একা কাজ করলেই তিনি তাঁর আবিষ্কারে কঠিন কঠিন জিনিস আমদানি করে ফেলেন। এই এক মাসে আমি তাঁকে যেসব জিনিস করা থেকে বন্ধ করেছি সেগুলো হচ্ছে :

(এক) মোরগের বাচ্চাগুলোর খাবার খুঁটে খেতে যেন অসুবিধে না হয় সেজন্যে তাদের ঠোঁটে স্টেনলেস স্টিলের খাপ পরিয়ে দেয়া।

(দুই) মোরগের বাচ্চাগুলোর অবসর বিনোদনের জন্যে ঘরের দেয়ালে মোরগের উপরে চলচ্চিত্র দেখানো।

(তিন) মোরগের বাচ্চাগুলো নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করছে কি না লক্ষ রাখার জন্যে ঘরে একটা টেলিভিশন ক্যামেরা বসিয়ে দেয়া।

(চার) শীতের সময় মোরগের বাচ্চার যেন ঠাণ্ডা লেগে না যায় সেজন্যে তাদের ছোট ছোট সোয়েটার বুনে দেয়া।

(পাঁচ) যেহেতু তারা মা ছাড়া বড় হচ্ছে, সেজন্যে নিজেদের ভাষা যেন ভুলে না যায় তার ব্যবস্থা করার জন্যে টেপরেকর্ডারে মোরগের ডাক শোনানো।

(ছয়) বাচ্চাগুলো ঠিকভাবে বড় হচ্ছে কি না দেখার জন্যে প্রত্যেক দিন তাদের ওজন করে গ্রাফ কাগজে ছকে ফেলা।

আমি কোনোভাবে নিঃশ্বাস চেপে আছি। আর দু'মাস কাটিয়ে দিতে পারলেই বাচ্চাগুলো বেশ বড়সড় হয়ে উঠবে। সফদর আলীর নতুন কিছু করার উৎসাহ বা প্রয়োজনও কমে যাবে। বাচ্চাগুলো বেশ তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে। কোনো অসুখ-বিসুখ নেই। সব মিলিয়ে বলা যায়, পুরো জিনিসটাই একটা বড় ধরনের সাফল্য। আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুর সাথে কথা বলে রেখেছি, জিনিসটাকে একটু প্রচার করে তারপর সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। একটা ছোট ওয়ার্কশপে সপ্তাহে একটা করে ইনকিউবেটর তৈরি করতে পারলেই যথেষ্ট, ব্যবসা তো আর করতে যাচ্ছি না।

ঠিক এই সময়ে আমার হঠাৎ বগুড়া যেতে হল। আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না, কিন্তু বড় সাহেব আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার হিসেবপত্রে কি নাকি গরমিল দেখা গিয়েছে। আমাকে গিয়ে সেটা ধরতে হবে। আমি যখন আপত্তি করছিলাম, তখন বড় সাহেব কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেললেন যে তিনি আমাকে খুব বিশ্বাস করেন। তা ছাড়া অন্য সবাই দায়িত্বশীল সাংসারিক মানুষ। আমার মতো নিষ্কর্মা আর কয়জন আছে যে ঘর-সংসার ফেলে জায়গায়-অজায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে পারে?

যাবার আগে সফদর আলীকে বারবার করে বলে গেলাম তিনি যেন এখন মোরগের বাচ্চাগুলোর ওপর নতুন কোনো গবেষণা শুরু না করেন। বাচ্চাগুলো চমৎকার বড় হচ্ছে, তাদের ঠিক এভাবে বড় হতে দেয়াই সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ, আর কিছুই করা উচিত না, তার যত বড় বৈজ্ঞানিক আইডিয়াই আসুক না কেন।

বগুড়া থেকে ফিরে আসতে বেশ দেরি হল। যাবার আগে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম একটি দুটি টেলিগ্রাম হয়তো পাব, কিন্তু কোথায় কি, কোনো খোঁজখবরই নেই। ফিরে এসেই সফদর আলীর বাসায় গেলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই যথারীতি কুকুরের ডাক, কিন্তু তারপর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি ঘরের দরজায় একটা চিঠি লিখে এলাম যে পরদিন বিকেলবেলা অফিস ফেরত আসব, সফদর আলী যেন বাসায় থাকেন।

banglabook.com

পরদিন সফদর আলীর বাসায় গিয়ে দেখি, দরজায় লাগানো চিঠিটা নেই, যার অর্থ তিনি চিঠিটা পেয়েছেন। আমি দরজায় ধাক্কা দিতেই কুকুরের বদরাগী ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। সফদর আলী আমার চিঠি পেয়েও বাসাতে নেই—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! দরজায় বার কয়েক শব্দ করার পর মনে হল একটা জানালা দিয়ে কেউ একজন আমাকে উঁকি মেরে দেখে জানালাটা বন্ধ করে দিল। জংবাহাদুর হতে পারে না, কিন্তু সফদর আলী এরকম করবেন কেন?

আমি পরপর আরো কয়েকদিন চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই সফদর আলীকে ধরতে পারলাম না। নিঃসন্দেহে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কেন? আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন কি? আমি মহা ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

সপ্তাহ দুয়েক পর সফদর আলীকে আমি কাওরান বাজারে সেই রেস্তরাঁয় আবিষ্কার করলাম, আমাকে দেখে আবার পালিয়ে না যান সেজন্যে শব্দ না করে একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে ডাকলাম, এই যে সফদর সাহেব।

সফদর আলী চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে গরম চা দিয়ে তিনি মুখ পুড়িয়ে ফেলেন। আমাকে দেখে তাঁর চেহারা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেক কষ্টে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, কী খবর ইকবাল সাহেব?

আমার আবার কিসের খবর, খবর তো সব আপনার কাছে। আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। কয়েক দিন আপনার বাসায় গিয়েছিলাম, চিঠি রেখে এসেছিলাম—

ও আচ্ছা, তাই নাকি, এই ধরনের কথাবার্তা বলে তিনি ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, কেমন গরম পড়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

আসলে তেমন কিছু গরম নয়, শুধু কথা বলার জন্যে কথা বলা, আমি সোজাসুজি আসল কথায় চলে আসি, মোরগের বাচ্চাগুলোর খবর কি?

সফদর আলী না শোনার ভান করে বললেন, নতুন ম্যানেজার এসেছে রেস্তরাঁয়, খুব কড়া, চায়ের কাপগুলো কি পরিষ্কার দেখেছেন?

আমি আরেকবার চেষ্টা করলাম, মোরগের বাচ্চাগুলোর কী খবর, কেমন আছে সেগুলো? কত বড় হয়েছে?

আছে একরকম, বলে সফদর সাহেব কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, টিভি দেখে দেখে জংবাহাদুরের চোখ খারাপ হয়ে গেছে, চশমা নিতে হয়েছে।

বানরের টিভি দেখে চোখ খারাপ হওয়ায় চশমা নিতে হয়েছে, খবরটা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু মোরগের বাচ্চার খবর জানতে চাইলে সেটা না দিয়ে এই খবর দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত কেন? আমি হাল ছেড়ে না দিয়ে আরো একবার চেষ্টা করলাম, বললাম, সফদর সাহেব, আপনি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছেন কেন? মোরগের বাচ্চাগুলো ভালো আছে তো?

সফদর আলী পরিষ্কার আমার কথা না শোনার ভান করে বললেন, ভীষণ চোরের উপদ্রব হয়েছে আজকাল, পাশের বাসা থেকে সবকিছু চুরি হয়ে গেছে।

আমি হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি যদি বলতে না চান আমি তো আর জোর করে বলাতে পারি না। তাঁর আবিষ্কার, তাঁর পরিশ্রম, আমি কোথাকার কে? কিন্তু কী হয়েছে বলতে এত আপত্তি কেন, আমি তো আর তাঁকে খেয়ে ফেলতাম

banglabook.com

না। ভারি অবাক কাণ্ড!

সফদর আলী আগের কথার জের টেনে বললেন, চোরটা ভারি পাজি। চুরি করে যা কিছু নিতে পারে নেয়, বাকি সব নষ্ট করে দিয়ে যায়। সেদিন একজনের রান্না করা খাবারে পুরো বাটি লবণ ঢেলে দিয়ে গেছে।

আমি কিছু না বলে চুপ করে থাকি। সফদর আলী বলতে থাকেন, আগের সপ্তাহে এক বাসা থেকে অনেককিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। যাবার আগে ছোট মেয়েটার পুতুলের মাথাটা ভেঙে দিয়ে গেছে, ভারি পাজি চোর!

আমি সফদর আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, না জানি কি হয়েছে মোরগগুলোর! আমাকে জোর করে চোরের গল্প শোনাচ্ছেন কেন?

সফদর আলী চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চোর ধরার একটা যন্ত্র বানাচ্ছি এখন, খুব কায়দার জিনিস হবে। একটা এস. এল. আর. ক্যামেরা জুম লেন্সসহ আছে, আগে ছবি তুলে ফেলবে। চোর ব্যাটা যদি পালিয়েও যায়, তার ছবি তোলা হয়ে যাবে।

সফদর আলী একাই অনেক কথা বলে গেলেন। আমার কথা বলার উৎসাহ নেই। প্রথমে তাঁর ব্যবহারে বেশ দুঃখই লেগেছিল, কিন্তু তাঁকে বেশ অনেকদিন থেকে চিনি। তাই দুঃখটা স্থায়ী হল না। ব্যাপারটা চিন্তা করে আস্তে আস্তে আমি ভারি অবাক হয়ে যাই, পুরো জিনিসটা একটা রহস্যময় ধাঁধার মতো। এই এক মাসে মোরগের বাচ্চাগুলোর কি হতে পারে, যা তিনি আমাকে বলতে চান না? আমার কথা না শুনে মোরগের বাচ্চাগুলোর উপর নিশ্চয়ই কিছু একটা গবেষণা করে পুরো ব্যাপারটি ঘোল পাকিয়েছেন। এখন আমাকে আর সেটা বলতে চাইছেন না। ছোটখাট নয়, বড় ধরনের কিছু। কিন্তু কী হতে পারে? আমাকে বলতে এত আপত্তি কেন?

এভাবে আরো সপ্তাহখানেক কেটে গেল। সফদর আলীর সাথে আজকাল দেখা হয় খুব কম, মোরগের বাচ্চার ব্যাপারটি এভাবে আমার কাছ থেকে গোপন করার পর আমিও নিজেকে একটু গুটিয়ে ফেলেছি। অনেক চেষ্টা করেও জানতে না পেরে আজকাল ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলাম। সেদিন অফিস ফেরত বাসায় যাবার সময় চায়ের দোকানে উঁকি মেরে দেখি সফদর আলী বসে আছেন। মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ, আমাকে দেখে তাঁর চেহারা আরো কেমন জানি কালো হয়ে গেল। শুকনো গলায় বললেন, কী খবর ইকবাল সাহেব?

আমি বললাম, এই তো চলে যাচ্ছে কোনোরকম। আপনার কী খবর? চোর ধরার যন্ত্র শেষ হয়েছে?

আজকাল আমি মোরগের বাচ্চার কথা তুলি না। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, হ্যাঁ, শেষ তো হয়েছিল।

লাগিয়েছেন চোর ধরার জন্যে?

হ্যাঁ, লাগিয়েছিলাম।

চোর এসেছিল?

সফদর আলী মাথা চুলকে বলল, হ্যাঁ, এসেছিল।

ধরা পড়েছে?

না।

তাহলে জানলেন কেমন করে যে এসেছিল?

সফদর আলী আবার মাথা চুলকে বললেন, জানি এসেছিল, কারণ পুরো যন্ত্রটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

আমার একটু কষ্ট হল হাসি গোপন করতে। চোর যদি চোর ধরার যন্ত্র চুরি করে নিয়ে যায় ব্যাপারটাতে একটু হাসা অন্যায় নয়। সফদর আলী আমার হাসি গোপন করার চেষ্টা দেখে কেমন জানি রেগে উঠলেন, বললেন, আপনি হাসছেন? জানেন আমার কত কষ্ট হয়েছে ওটা তৈরি করতে? কত টাকার যন্ত্রপাতি ছিল আপনি জানেন?

আমি বললাম, কে বলল আমি হাসছি? এটা কি হাসির জিনিস? কী ভাবে নিল চোর এটা?

সফদর সাহেব মাথা চুলকে বললেন, সেটা এখনো বুঝতে পারি নি। জিনিস মেঝের সাথে স্ক্রু দিয়ে আঁটা ছিল, পুরোটা খুলে নিয়ে গেছে। ভাগ্যিস জংবাহাদুর ছিল, নইলে সব চুরি করে নিত।

জংবাহাদুর কেমন আছে আজকাল?

ভালোই আছে, দিনে দিনে আরো অলস হয়ে যাচ্ছে।

চোখ খারাপ হয়ে চশমা নিয়েছে বলেছিলেন?

হ্যাঁ। মানুষের মতো নাক নেই তো, চশমা পরতে প্রথম প্রথম অনেক ঝামেলা হয়েছিল জংবাহাদুরের।

আমার হঠাৎ জিনিসটা খেয়াল হয়, সত্যিই তো, বানরের চশমা আটকে থাকবে কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম, কী ভাবে পরে চশমা?

সফদর আলী একটু হাসলেন, বললেন, সেটা আর কঠিন কী? মোরগের চশমা তৈরি করে দিলাম, আর এটা তো বানর।

আমি চমকে ঘুরে তাঁর দিকে তাকাই, মোরগের চশমা?

সফদর আলী হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, কেমন গরম পড়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

তখন মোটেও গরম পড়ছে না, দু'দিন থেকে আমার হাফহাতা সোয়েটারটা আর শীত মানতে চাইছে না বলে একটা ফুলহাতা সোয়েটার পরব বলে ভাবছি। কাজেই বুঝে নিলাম সফদর আলী কথাটা ঘোরাতে চাইছেন। সফদর আলী ভুলে মোরগের চশমার কথা বলে ফেললেন, এখন আর কিছুতেই মুখ খুলবেন না। আমি তাঁকে আর ঘাঁটালাম না, কথাটা কিন্তু আমার মনে গেঁথে রইল। মোরগের চশমা পরিয়ে তিনি একটা-কিছু অঘটন ঘটিয়েছেন। অঘটনটি কী জানার জন্যে কৌতূহলে আমার পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু লাভ কি? সফদর আলী তো কিছুতেই কিছু বলবেন না।

মাঝরাতে কেউ যদি কাউকে ডেকে তোলে, তার মানে একটা অঘটন। কখনো শুনি নি কাউকে মাঝরাতে ডেকে তুলে বলা হয়েছে সে লটারিতে লাখ-দু' লাখ টাকা পেয়েছে। তাই আমাকে যখন মাঝরাতে ডেকে তুলে বলা হল, আমার সাথে এক জন দেখা করতে এসেছে, ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। কোনোমতে লুঙ্গিতে গিঁট মেরে চোখ মুছতে মুছতে এসে দেখি সফদর আলী। আগে কখনো আমার বাসায় আসেন নি, এই

banglabook.com

প্রথম, সময়টা বেশ ভালোই পছন্দ করেছেন। আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, কী ব্যাপার সফদর সাহেব, এত রাতে?

রাত কোথায়? এ তো সকাল, একটু পরেই সূর্য উঠে যাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কথাটা খুব ভুল নয়, ভোর চারটার মতো বাজে, ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলে সূর্য যদি নাও ওঠে, চারিদিক ফর্সা হয়ে যাবে ঠিকই। এই সময়টাতে আমার ঘুম সবচেয়ে গাঢ়। লাখ টাকা দিলেও এই সময়ে আমি ঘুম নষ্ট করি না। আজ অবশ্যি অন্য কথা, বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো কাজে এসেছেন, না এমনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন?

সফদর আলী একটু রেগে বললেন, এমনি হাঁটতে হাঁটতে কেউ এত রাতে আসে নাকি?

আপনিই না বললেন এখন রাত নয়, এখন সকাল। ভাবলাম বুঝি আপনার মর্নিং–ওয়াক করার অভ্যাস।

আরে না না, মর্নিং–ওয়াক না, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি ব্যাপার?

একটু আগে সেই চোর ধরা পড়েছে। এখন তাকে নিয়ে কি করি বুঝতে না পেরে—

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, তাকে সাথে নিয়ে এসেছেন?

না না, কী যে বলেন!

কোথায় সেই চোর?

বাসায়। সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, চোর ধরা পড়লে কী করতে হয় জানেন?

আমি মাথা চুলকাই, চোর ধরা পড়লে লোকজন প্রথমে একচোট মারপিট করে নেয় দেখেছি। যাকে সারা জীবন নিরীহ গোবেচারা ভালোমানুষ বলে জেনে এসেছি, সেও চোর ধরা পড়লে চোখের সামনে অমানুষ হয়ে কী মারটাই না মারে! কিন্তু সেটা তো আর সফদর আলীকে বলতে পারি না। একটু ভেবে–চিন্তে বললাম, চোর ধরা পড়লে মনে হয় পুলিশের কাছে দিতে হয়।

সে তো সবাই জানে, কিন্তু দেয়টা কী ভাবে? চোর তো আর ওষুধের শিশি না যে পকেটে করে নিয়ে যাব। রিকশায় পাশে বসিয়ে নেব? যদি দৌড় দেয় উঠে?

বেঁধে নিতে হয় মনে হয়।

কোথায় বাঁধব?

হাতে।

হাত বাঁধা থাকলে মানুষ দৌড়াতে পারে না বুঝি?

আমি মাথা চুলকে বললাম, তাহলে মনে হয় পায়ে বাঁধতে হবে।

সফদর আলী ভুরু কুঁচকে বললেন, তাহলে ওকে নিয়ে যাব কেমন করে? কোলে করে?

সমস্যা গুরুতর। আমার মাথায় কোনো সমাধান এল না, জিজ্ঞেস করলাম, এখন কোথায় রেখে এসেছেন?

জংবাহাদুরের কাছে।

banglabook.com

আমি অবাক হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, একটা বানরের কাছে একটা ঘাগু চোর রেখে এসেছেন! মাথা খারাপ আপনার?

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, তাহলে কী করব? সাথে নিয়ে আসব?

কিন্তু তাই বলে একটা বানরের কাছে রেখে আসবেন?

আহা-হা, এত অস্থির হচ্ছেন কেন, আমি কি এমনি এমনি রেখে এসেছি, ঘরের সব দরজা-জানালাতে এখন বিশ হাজার ভোল্ট, পাওয়ার বেশি নেই তাই কেউ ছুঁলে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু দারুণ শক খাবে।

তাই বলেন, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, চোরকে তাহলে আসলে জংবাহাদুরের হাতে ঠিক ছেড়ে আসেন নি।

না, তা ঠিক নয়, জংবাহাদুরের হাতেই ছেড়ে এসেছি। হাই ভোল্টেজের সুইচটা জংবাহাদুরের হাতে, সে ইচ্ছা করলে চালু করবে, ইচ্ছা করলে বন্ধ করবে।

করেছেন কী! আমি লাফিয়ে উঠি, একটা বানরের হাতে এভাবে ছেড়ে আসা উচিত হয় নি। চোর নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে এতক্ষণে।

মনে হয় না, সফদর আলী গম্ভীর গলায় বললেন, জংবাহাদুর ভীষণ চালু, ওকে ধোঁকা দেওয়া মুশকিল।

কি জানি বাবা, আমার বানরের ওপর এত বিশ্বাস নেই। তাড়াতাড়ি চলেন যাই।

আমি দুই মিনিটে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। ভোরের ঘুমটা গেল, কিন্তু রোজ তো আর চোর ধরা পড়ে না, রোজ তো আর সফদর আলী একটা বানরের হাতে একটা ধড়িবাজ চোর ছেড়ে আসেন না!

ভেবেছিলাম হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু একটা রিকশা পেয়ে গেলাম। এত সকালে বেচারা রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে বেরিয়েছে কেন কে জানে! আমি রিকশায় উঠে সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, নতুন আরেকটা চোর ধরার যন্ত্র তৈরি করেছেন তাহলে?

নাহ্! সফদর আলী হঠাৎ করে কেমন জানি কাঁচুমাচু হয়ে যান।

তাহলে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, চোর ধরা পড়ল কেমন করে?

সফদর আলী কাঁচমাচু মুখেই একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, বেচারা চোর ভুল করে সেই মোরগের ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

এই প্রথম তিনি নিজে থেকে মোরগের কথা বললেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকি শোনার জন্যে তিনি কী বলেন। কিন্তু সফদর আলী আর কিছুই বললেন না। আমি বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী হল?

কী আর হবে, ভয়ে এক চিৎকার করে ফিট।

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ে, ভয়ে চিৎকার করে ফিট?

হ্যাঁ।

মোরগ দেখে ফিট?

ও বেচারা কি আর জানে নাকি ওগুলো মোরগ। ও ভেবেছে—

কী ভেবেছে?

কি জানি, কি ভেবেছে। সফদর আলী হাত নেড়ে থেমে পড়তে চাইলেন, কিন্তু আমি চেপে ধরলাম। সফদর আলী বাধ্য হয়ে সবকিছু খুলে বললেন, ঘটনাটা

banglabook.com

এরকম—

আমি বগুড়া চলে যাবার পরপরই সফদর আলীর মনে হল ছোট একটা জায়গায় এতগুলো মোরগের বাচ্চা পাশাপাশি থাকাটা তাদের মানসিক অবস্থার জন্যে ভালো নয়। যেহেতু তাদের জন্যে জায়গা বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই তিনি ঠিক করলেন মোরগের বাচ্চাগুলিকে এমন একটা অনুভূতি দেবেন যেন তারা অনেক বড় একটা জায়গায় আছে। ত্রিমাত্রিক সিনেমা দেখানোর জন্যে যেরকম ব্যবস্থা করা হয় তিনিও সেই একই ব্যবস্থা করলেন। ঘরের চারপাশের দেয়ালে গাছপালা–বাড়িঘর ইত্যাদির দুইটি করে ছবি এঁকে দিলেন। একটি লাল রং দিয়ে, আরেকটি সবুজ। ছবি দুটির মাঝখানে একটু ফাঁক রাখা হল, যেখানে ফাঁক যত বেশি, সেখানে ছবিটাকে মনে হবে তত বেশি দূরে। দূরত্বের এই অনুভূতি আনার জন্যে অবশ্যি একটা বিশেষ ধরনের চশমা পরতে হয়। এই চশমার একটা কাচ সবুজ, আরেকটা লাল। এই চশমা পরে লাল আর সবুজ রঙের আঁকা ছবিটির দিকে তাকালে দুই চোখ দিয়ে দুটি আলাদা আলাদা ছবি দেখতে পায়। এক চোখে দেখে লাল রঙে আঁকা ছবি অন্য চোখে দেখে সবুজ রঙে আঁকা ছবি। আমরা কখনোই দুই চোখ দিয়ে দুটি আলাদা আলাদা জিনিস দেখি না। এবারেও মস্তিষ্ক চোখ দুটিকে বাধ্য করে দূরে এক জায়গায় একান্তে যেন দুটি ছবি একত্র হয়ে একটি ছবি হয়ে যায়। কাজেই ছবিটি দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু মনে হয় দূরে। আর তাই দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোকে মনে হবে অনেক দূরে ছড়ানো।

দেয়ালে ছবি আঁকা শেষ করে সফদর আলী মোরগের চশমা তৈরি শুরু করলেন, তখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মোরগের দুই চোখ দুই পাশে, মানুষের মতো সামনে নয়। দুই চোখ সামনে না থাকলে দূরত্ব বোঝা যায় না। কাজেই সফদর আলীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সফদর আলী অবশ্যি হাল ছাড়ার মানুষ নন। তাই তিনি একটা সমাধান ভেবে বের করলেন। ছোট ছোট দুটি আয়না তিনি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে চোখের দু' পাশে লাগিয়ে দিলেন। মোরগের এভাবে দেখে অভ্যাস নেই, তাই সেগুলো প্রথম কয়দিন অন্ধের মতো এদিকে–সেদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যখন ডানদিকে যাবার কথা তখন বামদিকে যায়। আবার যখন বামদিকে যাবার কথা তখন যায় ডানদিকে। সপ্তাহখানেক পরে সেগুলোর একটু অভ্যাস হল, তখন একটা ভারি মজার ব্যাপার দেখা যায়, মোরগগুলো ক্রমাগত মাথা না নেড়ে সবসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সফদর আলীর মতে জিনিসটা দেখতে খুবই অস্বাভাবিক, আগে থেকে জানা না থাকলে ভয় পাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। মোরগের চোখ দুটি সামনের দিকে এনে তাদের বাইনোকুলার দৃষ্টি দেবার পর তিনি তাদের চশমা পরাতে শুরু করলেন। এক চোখে লাল আরেক চোখে সবুজ চশমার কাচে মোরগগুলোকে দেখতে ভয়ংকর দেখাতে থাকে। কিন্তু তারা নাকি দূরত্বের অনুভূতি পাওয়ার ফলে হঠাৎ করে মানসিকভাবে ভালো বোধ করতে শুরু করে। সফদর আলী সেটা কী ভাবে জেনেছেন জিজ্ঞেস করলে মাথা চুলকে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন।

মোরগগুলোর ওপর সফদর আলী আরো কী কী গবেষণা করেছেন সেটা বলে শেষ করার আগেই আমরা তাঁর বাসায় পৌঁছে যাই। সফদর আলী রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দরজার কাছে গিয়ে একটা হাঁক দিলেন, জংবাহাদুর, হাই ভোল্টেজ বন্ধ করে

banglabook.com

দাও, একদম বন্ধ!

জংবাহাদুর নিশ্চয়ই হাই ভোল্টেজ বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ সফদর আলী ইলেকট্রিক শক না খেয়েই ভেতরে এসে ঢুকলেন। পিছু পিছু আমিও ঢুকছিলাম। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড ইলেকট্রনিক শক খেয়ে সফদর আলী আর আমি দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ি। কয়েক মুহূর্ত লাগে আমার সম্বিৎ ফিরে পেতে। প্রথমেই দেখতে পেলাম ঘুলঘুলিতে জংবাহাদুর ঝুলে আছে। চোখে চশমা এবং সেই অবস্থায় সে পেট চেপে হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সফদর আলী কাপড়ের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বললেন, কেমন পাজি দেখেছেন বেটা বানর?

এইটা আপনার বানর?

গলার স্বরে আমি চমকে তাকাই, খালি গায়ে তেল চিকচিকে একটা মানুষ গালে হাত দিয়ে মেঝেতে বসে অছে। নিশ্চয় চোর হবে, দেখে মনে হয় দিব্যি একটা ভালোমানুষ।

সফদর আলী গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

লোকটা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বলল, আমি যদি এই বেটার জান শেষ না করি তাহলে আমার নাম ইদরিস মোল্লা না।

আমি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলাম, কেন, কি হয়েছে?

জিজ্ঞেস করতে হয় কেন? লোকটা ভীষণ রেগে ওঠে, আপনার পোষা বানর যদি আপনাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মজা দেখায়, তাহলে আমার কী অবস্থা করেছে বুঝতে পারেন না?

সফদর আলী মুখ শক্ত করে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি পালানোর চেষ্টা করেছিলে।

লোকটা মুখ ভেংচে উত্তর দিল, সেটা খুব অন্যায় হয়েছে? আপনি লোক জড়ো করে মারপিট করার ব্যবস্থা করলে দোষ হয় না, আর আমি পালানোর চেষ্টা করলে দোষ?

চোর বেচারা আমাকে দেখে মনে করেছে তাকে পিটুনি দিতে এসেছি। আমার চেহারা এমন যে দেখলেই মনে হয় কাউকে ধরে বুঝি মার দিয়ে দেব। ছোট বাচ্চারা এ জন্যে পারতপক্ষে আমার ধারে-কাছে আসে না। শুনেছি আমার পরিচিত কিছু ছোট বাচ্চাকে আমার কথা বলে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়। যাই হোক, আমি চোরটার ভুল ভেঙে না দিয়ে একটা হুঙ্কার দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে আটকে দিলাম। এখন পুলিশে খবর দিতে হবে। তার সাথে আমার অন্য কৌতূহল রয়ে গেছে। সফদর আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, মোরগগুলো কোথায়?

সফদর আলী ইতস্তত করে বললেন, ঐ তো, ঐ ঘরে।

একটু দেখে আসি।

সফদর আলী অনিচ্ছার স্বরে বললেন, যাবেন দেখতে?

কী আছে, দেখে আসি।

সফদর আলী না করলেন না, কিন্তু খুব অস্বস্তি নিয়ে গোঁফ টানতে থাকেন।

আমি দরজা খুলে ঘরটাতে ঢুকলাম। অন্ধকার ঘর, একটা চাপা দুর্গন্ধ, মোরগের ঘরে যেমন হবার কথা। দেয়াল হাতড়ে বাতির সুইচ না পেয়ে হঠাৎ মনে পড়ল তার বাসায় হাততালি দিলেই বাতি জ্বলে ওঠে। আমি শব্দ করে একটা হাততালি দিলাম·

banglabook.com

আর সত্যিই সাথে সাথে বাতি জ্বলে উঠল। না জ্বললেই ভালো ছিল, কারণ তখন যে দৃশ্য দেখতে হল, মানুষের পক্ষে সে দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব না।

আমি আতঙ্কে পাথর হয়ে গেলাম। আমার চারদিকে থলথলে আশ্চর্য এক ধরনের প্রাণী। প্রাণীগুলোর গোল গোল বড় বড় চোখ, ড্যাবড্যাব করে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণীগুলো আমাকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে, তারপর হঠাৎ একসাথে খাই খাই করে থলথলে শরীর টেনে-হিঁচড়ে আমার দিকে এগুতে থাকে। সফদর আলী মোরগের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এগুলো তো মোরগ নয়, এগুলো সাক্ষাৎ পিশাচ। আতঙ্কে চিৎকার করে আমি পালানোর চেষ্টা করি—তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি সফদর আলী মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছেন। ওপরে চশমা চোখে জংবাহাদুর ঘুলঘুলি ধরে ঝুলে আছে, আবার সে পেট চেপে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমাকে চোখ খুলতে দেখে সফদর আলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তখনি বলেছিলাম গিয়ে কাজ নেই, ভয় পেতে পারেন।

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, ওগুলো কী?

কেন, মোরগ।

ওরকম কেন?

ভাবলাম মোরগ রান্না করতে হলে যখন পালক ছাড়াতেই হয়। আগে থেকে ওষুধ দিয়ে পালক ঝরিয়ে ফেললে কেমন হয়। পালক ঝরে যাবার পর দেখতে খারাপ হয়ে গেল। তা ছাড়া মোটা হওয়ার ওষুধটা একটু বেশি হয়ে সবগুলো বাড়াবড়ি মোটা হয়ে গেছে। মোটা বেশি বলে খিদেও বেশি, সবসময়েই এখন খাই খাই। যা-ই দেখে তা-ই খেতে চায়, মানুষজন দেখলেও চেষ্টা করে খেতে।

আমি সাবধানে বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিই। কতদিন ঐ দৃশ্য মনে থাকবে কে জানে!

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। চোরকে থানায় দেবার পর তার বাসা থেকে সফদর আলীর চোর ধরার যন্ত্রসহ অনেক চোরাই মালপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সফদর আলী মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চোর ধরার জন্যে কী একটা পুরস্কার পেতে পারেন বলে শুনেছি। তিনি এখনো গবেষণা করে যাচ্ছেন মোরগগুলোকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে। জিনিসটি অসম্ভব নয়, কিন্তু বেশ নাকি কঠিন। আমি অবশ্যি খুব আশাবাদী নই। তাঁর ইনকিউবেটর অবশ্যি ঠিক আছে। আমি আপাতত সেটাই সাধারণ মানুষের কাছে বিলি করানো যায় কি না বোঝানোর চেষ্টা করছি।

দেখি কি হয়!